জগদীশ গুপ্তের লঘু-গুরু অথবা উত্তমের সফলতা-নিষ্ফলতা

কিওসলস্কির 'ডেকালগ' যে দশটি ছোট কাহিনীচিত্রের সিরিজ তার একটি পর্বে এক পিতাপুত্রের গল্প বলা হয়েছে। বাবা সম্ভবত ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে দক্ষ এক মানুষ, ছেলেটিও কম্পিউটারে সড়গড়। যা কিছু তারা করে, সবই ইন্টারনেট থেকে ডেটা ডাউনলোড করে নির্ভুল হিসেব কষে করে। গল্পের সময় শীতকাল। ছেলেটি সকালে আইস-স্কেটিং করতে যাবে বলে আগের রাতে বাবার সঙ্গে কম্পিউটারে বসে বাড়ির কাছের লেকের ওপর জমা বরফ ক-ইঞ্চি পুরু হয়েছে ইন্টারনেট থেকে ডেটা নিয়ে হিসেব কষে দেখে নেয়। পরের দিন আইস-স্কেটিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয় ছেলেটির। বরফের স্তর এক জায়গায় পাতলা ছিল, সেখানে বরফ ভেঙে ছেলেটি নীচের জলে ডুবে যায়— আশপাশের বরফ পুরু হওয়ায় বেরিয়ে আসতে পারে না। তখন দর্শকের মনে পড়ে, হ্যাঁ, গোটা সিনেমাতেই বার কয়েক এক পথবাসীকে তো দেখা গিয়েছিল, এমন কি বাবা ছেলে দুজনে মিলে যখন ইন্টারনেট ঘেঁটে হিসেব কষছে কাল সকালে বরফ ক-ইঞ্চি পুরু হবে, তখনও ভবঘুরে মানুষটিকে দেখা গিয়েছিল, প্রবল শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে আগুন জ্বেলেছে সে। সেই আগুন জ্বালার জায়গাটায় বরফের পাতলা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আসলে বাবা ও ছেলের হিসেবে আসেনি। পথবাসীদের গেরিলা-কায়দায় বাঁচার ডেটা পেতে এখনও রাষ্ট্রের ঢের দেরি আছে।

তো, হিসেবের এরকম গরমিল হয়! সমাজের যে অন্ধকারময় অংশে শিক্ষার, সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেনি, সেখানে থাকা সুখসুবিধাহীন মানুষদের কথা আমরা ভুলে যেতে চাই এভাবেই। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত গল্প উপন্যাসের তথা গদ্যসাহিত্যের একটা ট্র্যাজেডি হল, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী লেখকেরা বিচরণ করতেন এক শিক্ষিত মধ্যবিত্তমদির জগতে, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও এক ধরনের আরোপিত শুভচেতনায় যে জগতের মানুষদের চিন্তাভাবনা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ফলত এই শিক্ষার আলোক তথা সুযোগ-সুবিধে প্রাপ্ত মানুষদের ছোট ও সংকীর্ণ পরিধির বাইরে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষের যে শুভাশুভ বোধহীন, সামাজিক নিয়মকানুনের সবিশেষ তোয়াক্কা না করে

বেঁচে থাকা, কলুষকে জীবনযাপনের স্বাভাবিক উপাদান ভেবে গ্রহণ করা, সেটা বাংলা সাহিত্যের মান্য পরিধির বাইরে রয়ে যায়।

বিদুষী পাঠিকা, ভুল বুঝবেন না আমাদের, এই ভাগাভাগি শুধু অর্থনৈতিক বিভাজন মানে গরীব মানুষ ও বড়লোকদের গল্পকে আলাদা করে দাগানো নয়, এই বিভাজনের মূল আরো গভীরে নিহিত। ইউরোপিয় রেনেসাঁস— ইংরেজদের হাতফেরতা হয়ে বাংলার তথাকথিত রেনেসাঁসের রূপ নিলেও তার সুফল তথা শিক্ষার চেতনার বিস্তার, বিবিধ কুসংস্কার (যেমন সতীত্বের ধারণা, স্বামী যেমনই হোক, স্ত্রীর কর্তব্য পতিব্রতে নিষ্ঠ থাকা) থেকে মুক্তি, নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করে তার সুন্দর ও শোভন ব্যবহার, শুধু আত্মীয়স্বজন বা শ্রেণীবর্ণধর্ম ভিত্তিক সমাজের মধ্যে ঘোরাফেরা না করে, বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে ও ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করা— এইসব এই শ্রেণীতে পৌঁছোয়নি। এরা রয়ে গেল যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই। এখন যারা বাংলার রেনেসাঁসের উপরুল্লিখিত সুযোগসমূহ গ্রহণ করল তাদের অলিখিত একটা দায়িত্ব ছিল প্রাপ্ত সুফলগুলো বিস্তৃত করার। বিস্তৃত করা, শুধু অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেদের মধ্যে নয়, চেতনার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যেও। সেটা, যতটা হওয়ার ছিল হল না, অনেক মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, অনেক গহন ক্ষতি ক্লান্ত করে দিয়ে গেল আমাদের! উল্টে শিল্পী সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে এক নতুন বিভাজনের সৃষ্টি হল। ডেকালগের উল্লেখিত কাহিনীটির পিতাপুত্রের মত একটি শ্রেণীর উদ্ভব হল যারা অন্যদের গুনতির মধ্যেই নিতে চাইল না। বাংলা গল্প উপন্যাস (রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত) পড়লে মনেই হবে না, এই গ্রাম্য, হীনমনা, কুসংস্কারগ্রস্ত, অপরাধপ্রবণ, পরস্পরের প্রতি নির্মম, সামাজিক বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না-করা মানুষজনের অস্তিত্ব আছে। যদি বা কোথাও সমাজের প্রান্তিক চেতনার মানুষের কথা বলা হল, দেখা গেল, সেখানেও তাদের প্রকৃত স্বরূপে নয়, মধ্যবিত্তমদির জগতের মূল্যবোধের ছাঁকনিতে ছেঁকে ও ছেঁটে নেওয়া হয়েছে। এই ছেঁটে নেওয়া তথা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে স্যানিটাইজ করা লোকযাত্রার বিবরণের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল 'অপর' মূল্যবোধের তথা মূল্যবোধহীন মানুষেরা— যাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন তিক্ত বাস্তবে, চৈতন্যগত দিক থেকে গভীর তমসায় থাকা প্রতিবেশে।

জগদীশ গুপ্তের বাজি-জেতা

আমি বাজি জিতিয়াছি। —

আমার স্ত্রী একদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,— তুমি অতিশয় অকর্মা মানুষ।

পাঁচ বছর বেকার বসিয়া আছি কিনা, তাই।

আমি বলিয়াছিলাম— অকর্মা মানুষ আমি? অমুক করেছি, তমুক করেছি, এ করেছি, ও করেছি, সাত করেছি, পাঁচ করেছি...— ছাই করেছ— বলিয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন— লেখ দেখি এমনি ধারা গল্প; —

হাতে তখন তাঁর ছোট গল্পের বই একখানা ছিল।

— বেশ, নিও তুমি গল্প, গল্পই দেব।

বেকার অবস্থায় পাঁচটি বছর জলের মতো কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু গল্প লিখিবার উদ্যোগপর্বেই সময় দুর্বহ হইয়া উঠিল।... কিছুই মনে আসে না।...

দিনদুই প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একটি গল্প লিখিলাম, সে গল্প ওই 'জহর';

স্ত্রী গল্প পড়িয়া আমাকে বলিলেন, — তুমি অকর্মা ত বটেই, উপরন্তু, প্রথম শ্রেণীর লম্পট।

সে যাই হোক, গল্প ছাপাইতে হইবে, সেই কাজে লাগিয়া গেলাম, এবং দমাদম ফেরৎ আসিতে লাগিল। স্ত্রী হাসিয়া আকুল।

স্ত্রী বলিলেন, কিন্তু এত যে খরচ করিলে সেটা উঠিল কৈ? ভগবানের কৃপায় 'প্রবাসী' দুটি গল্পের জন্য ১৪ টাকা ৫০ পয়সা দিল, আমি বাজি জিতিলাম।

বিষয়গৌরবে ও ভাষাচেতনায় শ্রেষ্ঠ দশটি বাংলা উপন্যাসের তালিকায় থাকার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস লঘু-গুরু (যেখানে এই অদৃশ্য মানুষদের দেখানো হয়েছিল তাঁদের প্রকৃত স্বরূপে) বিষয়ে বৃহত্তর পাঠকের ঔদাসীন্যের কারণ কী সেটা আমাদের খুঁজে দেখতে ইচ্ছে হয়। লেখকের পরবর্তী রচনা তাঁর পূর্ববর্তী রচনার অর্থ পাল্টে দেয়। কিন্তু এই আলোচনায় আমরা লঘু-গুরুকে জগদীশ গুপ্তের সামগ্রিক সাহিত্যপ্রবণতার সঙ্গে না জুড়ে, একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস হিসেবেই বিবেচনা করব, না হলে বোঝা যাবে না রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যরুচি, সমকালীন লেখকেরা বা সমকালীন পাঠকেরা যার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন, সেখানে লঘু-গুরু কীরকম কালাপাহাড়ি ভুমিকা নিয়েছিল।

হাসান আজিজুল হক তাঁর 'জগদীশ গুপ্ত : কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত' প্রবন্ধে অসামান্য লিখেছিলেন, 'জগদীশ গুপ্ত জনপ্রিয় লেখক নন এবং ভবিষ্যতেও তাঁর রচনা যে হু হু করে কাটবে তা মনে হয় না। এর অনেক কারণ আছে। একটা বিশেষ কালে সাহিত্য পাঠকের এক ধরনের সাহিত্যরুচি গড়ে ওঠে। সমকালীন রচনার বড়ো ধারাটা এই রুচিকেই পুষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র তাঁদের কালে একটা জবরদস্ত সাহিত্যরুচি গড়ে তুলেছিলেন। জবরদস্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, সাহিত্যপাঠক তাঁদের গড়ে তোলা সাহিত্যরুচির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণে একরকম বাধ্য হতেন।'

বিদুষী পাঠিকা, এই নয় ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে লঘু করে দেখানোর

কোন হিডন অ্যাজেন্ডা আছে আমাদের। কিন্তু পরিচয় প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'লঘু-গুরু'-র অসহিষ্ণু সমালোচনাটিই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তার যোগ্যস্থানটি না পাওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। বলার কথাটা এই যে সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম ঘটে— পূর্বসূরী কোনো লেখক কখনো কখনো অন্য লেখকের সাহিত্যকৃতির গুণপনার হদিশ করতে পারেন না। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ভার্জিনিয়া উলফ ও জেমস জয়েসের মধ্যেও। উলফ ছিলেন স্ট্রিম অফ কনশাসনেস রীতির প্রধান একজন লেখক, কিন্তু জয়েসের 'ইউলিসিস' যা আজ চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত এবং যে উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এলিয়টের মত গুণীজনদের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়, সেই উপন্যাসটির বিষয়ে উলফ নিজের বিরূপতা প্রকাশ করেন নানাভাবে। পার্থক্য শুধু একটাই, উলফের বিরূপ সমালোচনা ইউলিসিসের পাঠক সমাদরের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না আর রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা বাংলা উপন্যাসের বৃহত্তর পাঠকের সমর্থন পেয়ে যায়। এটাকে প্রায় বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের একটা বিপর্যয় বলা যায়, কারণ 'লঘু-গুরু'-র পাঠক সমাদর না পাওয়া, বাংলা উপন্যাসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা একটিই— ফরাসি উপন্যাসের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় রাবলে-র গার্গাঁতুয়া-প্যান্টাগ্রুয়েলের অনুপস্থিতি। প্রকৃত প্রস্তাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের প্রাগৈতিহাসিকের মত কয়েকটি গল্প, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটির মত কয়েকটি লেখা ও মতি নন্দীর বারান্দা ও করুণাবশত উপন্যাসের মত ব্যতিক্রম বাদ দিলে সত্যিই বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় লঘু-গুরুর প্রভাব বিরল।

জীবন ও জগৎকে জগদীশ গুপ্তের পূর্ববর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকেরা দেখেছেন রোম্যান্টিকতা, নৈতিকতা বা উচ্চ আদর্শের চশমা পরে। সাদা চোখে, জীবন প্রকৃত যা— মানুষ স্বরূপত যেরকম, তাকে অবিকল সেভাবে আঁকতে পারাটাই মুগ্ধ হয়ে দেখবার লঘু-গুরুতে।

বাংলা উপন্যাসের আরও একটি ট্র্যাজেডি হল এই বাদ পড়ে যাওয়া বিপুল জন-সমষ্টির মুখের যে ভাষা, যা শিষ্ট নয়, টিপিক্যাল, যার মধ্যে আঞ্চলিক ভোকাবুলারি ও স্ল্যাং-এর প্রাদুর্ভাব, সেই সমৃদ্ধ ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া। ফলে ভাষা হয়ে পড়ে নিরক্ত শৌখিন, ড্রইংরুমে যে ভাষায় ভদ্রলোকেরা কথা বলে সেই ভাষা।

লঘু-গুরুতে জগদীশ গুপ্ত ভাষার এই নিয়ন্ত্রিত আড়ষ্ট ব্যবহারের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। বেশ্যা-রমণীর, অশিক্ষিত নিম্নরুচি মহিলার মুখের ভাষার অবিকল ব্যবহারের ফলে লেখাটি ভাষাগত, অনুভূতিগত দিক থেকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। লঘু-গুরুর অপরিচিত জগৎকে বাংলা উপন্যাসের পাঠকের কাছে তুলে ধরা বা এই জগতের চরিত্রদের মুখের ভাষাকে বাংলা উপন্যাসের ভাষার মূল স্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বই লঘু-গুরুর একমাত্র গুণপনা নয়, এর মহত্ত্ব, এই জগতের মানুষের অচেনা অংশটুকুর,

তার অন্তর্জগতের আবিষ্কার। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাস বলতে গেলে এই প্রথম বাস্তবতার ও প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল।

জগদীশ গুপ্তের বেয়াড়া নাচ

... এই ছেলেটা থাকে যদি বেঁচে
দেখে নিও, নাচাবে ও বেয়াড়া নাচ নেচে

নির্ভুল দৃষ্টি : জগদীশ গুপ্ত

কেমন ছিল সেকালের বাংলা উপন্যাসের চরিত্রেরা? মানে আপ-টু শরৎচন্দ্র? তারা বাস্তব চরিত্রের মত হীনমনা নয়, কুৎসিত মানসিকতার নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় টুকীর স্বামী পরিতোষের মত 'কোমরবাঁধা শয়তান' নয়, ভালোমন্দ মেশানো মানুষ, গরীব বড়লোক বা মধ্যবিত্ত যে শ্রেণী থেকে আসুক না কেন, তাদের মূল্যবোধ, চিন্তাভাবনার ধরন আমাদের অচেনা মনে হয় না, লঘু-গুরুর টুকীর বাবা বিশ্বম্ভরের মত কেউ পাষণ্ড নয়, ঘোর বর্ষায় ভিজে ভিজে পেছল উঠোন দিয়ে এঘর-ওঘর করে মদের চাটের উপকরণ জোগাড় করে দিতে আপত্তি জানালে কেউ অন্তঃসত্ত্বা বৌকে তেড়ে মারতে যায় না বিশ্বম্ভরের মত এবং তার ফলে পালাতে গিয়ে সেই বৌয়ের মৃত্যু হয় না। উপন্যাসের প্রথম দু পাতার মধ্যে পাঠকের জানা হয়ে যায় এই ঘটনা। এবং মর্মান্তিক ঘটনাটি লেখক বিবৃত করেন অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে :

'...প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যাইয়া টুকীর মা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়— এবং টুকী ভূমিষ্ঠ হয় অকালে— তখন সেখানে কেউ ছিল না।

শৃগালে নাকি টুকীর গা শুঁকিতেছিল, হঠাৎ কে আসিয়া পড়ায় শৃগাল পলায়ন করে।'

এই যার জন্মবৃত্তান্ত এবং যার তিনকুলে বিশ্বম্ভরের মত এক পাষন্ড বাবা ছাড়া কেউ নেই, তার জীবনবৃত্তান্ত কী রকম হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়, কিন্তু ঘটনা সে দিকে গড়ায় না। উত্তম নামের এক বেশ্যাকে বিশ্বম্ভর ঘরে নিয়ে আসে, যে, ঘটনার অনুমেয় অভিমুখ বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে।

লঘু-গুরু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তিগুলো ছিল যথাক্রমে

১। এই উপন্যাসে বর্ণিত লোকযাত্রা তাঁর অচেনা

২। এক গণিকাকে (উত্তম) ঘরে এনে তার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বসবাস করায় সমাজের অচাঞ্চল্য

৩। 'পতিতা নারীর (উত্তমের) সতীত্বের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, এই তত্ত্বটাকে একটা চমক-লাগানো অলঙ্কারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে। ... বেশ্যাবৃত্তিতে যে-

মেয়ে অভ্যস্ত সেও একদা যে-কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্‌গৃহিনীর জায়গা করে নিতে পারে, এই কথাটাকে স্বীকার করিয়ে নেবার ভার লেখক নিয়েছেন।'

আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। উত্তমের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করে নিয়েছেন 'ভাবে ভঙ্গিতে বোধ হচ্ছে এককালে উত্তমের সমাজ বিশ্বম্ভরের সমাজের চেয়ে শিক্ষায় আচরণে ওপরের স্তরেই ছিল।' উত্তমের মানসিক গঠনটা তার গৃহসজ্জা, বিদ্যাবুদ্ধি, কথাবার্তার ধরন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি থেকে মোটামুটি বোঝা যায়। কী করে উত্তম গণিকায় পরিণত হল সে কথা লেখক বলেননি, বলার দরকার ছিল না। সে ধরনের কাহিনী আমরা অনেক শুনেছি। তবে তার স্বাভাবিক প্রবণতা যে এর বিপরীত ছিল, তা বোঝা যায় লেখকের বর্ণনায়— 'মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার *বিদ্যাটা চেষ্টা করিয়া, ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল*— তখন তার নাম ছিল বনমালা, তারও আগের নাম ছিল তার যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু।'

'কপালকুণ্ডলা'-র নবকুমার কাষ্ঠাহরণে গেলে, তাকে ফেলে তার সহযাত্রীরা পালায়— এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' এই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নৈতিকতা, যা জগদীশ গুপ্ত-পূর্ব বাংলা উপন্যাসে চারিত্র্যলক্ষণ, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'লঘু-গুরু' উপন্যাসে দেখানো হয়, তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইতে পারিলাম না। এই উপন্যাস বস্তুত উত্তম-হতে-চাওয়া বনমালার কীটদষ্ট জীবনের অনুপম ক্রনিকল।

হ্যাঁ, মানুষ যূথীর শত্রু। জীবনের সমস্ত কলুষ পেরিয়েও তার মধ্যে একজন ভালোমানুষের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, বেশ্যাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি ঘর পেলে সে সদ্‌গৃহিনী ও ভালো মা হতে পারে এটা আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের মানুষদের বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয়। এ সেই অপরিচয়ের অভিশাপ যখন এক বিপুল জনসমষ্টিকে 'নেই' করে দিই আমরা, গুনতিতে নিই না তাদের, কোথাও বরফ পাতলা হয়ে যায় সেই গুনতির বাইরের শীতার্ত মানুষের শরীরকে তাতিয়ে রাখার জন্য জ্বালানো আগুনের তাপে— আমাদের চেতনার সলিল সমাধি হয় সেই পাতলা হয়ে যাওয়া বরফ ভেঙে।

!! জগদীশ গুপ্তের কাটামুণ্ডু !!

এক প্রকাশকের অনুরোধে জগদীশ গুপ্ত একবার একটি গোয়েন্দা উপন্যাস লেখেন। প্রকাশক উপন্যাস পড়ে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা চাইলেন। জগদীশ গুপ্তের নির্দেশে তাঁর খুড়তুতো ভাই একটি ফোটো তৈরি করে দিলেন যেখানে জগদীশ গুপ্তের কাটা মুণ্ডু তাঁরই হাতে ধরা আর মুণ্ডু থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে। সেই ছবির সঙ্গে একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রকাশককে তিনি লিখলেন, 'আরও ভয়াবহ উপন্যাস

চাইলে এই অবস্থা প্রাপ্তির পর শূন্যমার্গে নাকি ঘুরে কথা বলা ছাড়া উপায় নাই।'

জগদীশ গুপ্ত : হীরেন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

বিশ্বম্ভরের সঙ্গে এসে বাস করার মধ্যে উত্তমের যে একটা অন্য চ্যালেঞ্জ ছিল, খুব স্পষ্ট করেই লেখক সে কথা বলেছেন : 'মনে মনে সে কল্পনা করিত, বিপরীত পথে চলিয়া শয়তানকে শাসন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেও না জানি কত আনন্দ— ভালবাসা দিয়ে সুখী করাও বুঝি সুখের।' এরপর টুকীকে ভদ্রঘরের মেয়ের মতো করে তোলা, তাকে এক সুস্থ পরিবেশে বড় হতে দেওয়ার কাজটাও সে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নেয় এবং নিজের জীবনের সার্থকতা সে এই দুটো চ্যালেঞ্জের মধ্যেই খোঁজে। প্রথম ক্ষেত্রে সে কিছুটা সফল হয়, বিশ্বম্ভরের চরিত্র কিছুটা সংশোধিত হয়— এমনকি টুকী বড় হলে তাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করার সুরুচিও উত্তম বিশ্বম্ভরের মধ্যে রোপণ করে দিতে পারে। যদিও কথায় কথায় উত্তমকে মনে করিয়ে দেয় বিশ্বম্ভর, সে পরিবারের মঙ্গলময়ী বধূ নয়, এক একদা-বেশ্যা মাত্র এবং টুকীকে ভদ্রঘরের সংস্কার আচার শেখানোর চেষ্টা করলে সেই কথা টেনে এনে উত্তমকে বাধা দেয়। উত্তমের এই কাজে বাধাটা শুধু বিশ্বম্ভরের কাছ থেকে আসে না, আসে তার নিম্নরুচির অশিক্ষিত প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও।

টুকীর এক বন্ধু যখন জানে, উত্তমের দেওয়া টুকীর হাতের চুড়ি দুটি সোনার তখন সে টুকীকে জিগেস করে, 'মানুষের ঘাড় ভেঙে কত টাকা এনেছে রে তোর মা?' সেই সময়, 'হাসিতে হাসিতে একটি নিদারুণ কথা, সাপের বিষদাঁতে যেমন বিষ জমে তেমনি, মোক্ষর মায়ের জিহ্বাগ্রে আসিয়া জমিল— মোক্ষর মা অনুভব করিতে লাগিল, একটি স্থানে সেই সঞ্চিত বিষ ঢালিয়া বিষের ভাণ্ড উজাড় করিতে না পারিলে সে নিজেই যেন বাঁচিবে না।' সুতরাং মোক্ষর মা টুকীর কানের কাছে মুখ নিয়ে সেই অপাপবিদ্ধা বালিকাকে জানাল, '—তোর মা বেশ্যে ছিল; গয়না দিয়েছে হাজার লোকে— তোর এ বাবা দেয়নি।'— এবং জানিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করল। এটাও লঘু-গুরুর একটা প্রধান থিম, অপরিমেয় ইতরতা-নীচতার কাছে পবিত্রতা সংবেদনশীলতা শুচিশুদ্ধতার এই অনিবার্য হেরে-যাওয়া। কিন্তু এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও টুকীকে উত্তম ভদ্রঘরের মেয়ের মতো মানুষ করে, সৎপাত্রের সন্ধানে বিশ্বম্ভরকে পাঠায় বিভিন্ন জায়গায়। এই পর্বে তার মায়ের সম্বন্ধে টুকীর মনোভাব তাঁর অসামান্য গদ্যে বিবৃত করেছেন লেখক:

'মায়ের সম্বন্ধে টুকীর জানিতে কিছুই বাকি নাই— কিন্তু প্রসূত ফলের রসমাধুর্যই সারা প্রাণ দিয়া সে অহর্নিশি উপভোগ করিয়াছে; চরিতার্থতায় ধন্য কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া গেছে; বৃক্ষমাতার কোথাও কদর্যতা আছে কিনা চোখ মেলিয়া সে দেখিতে যায় নাই।'

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে উত্তম একটি অসাধারণ ট্র্যাজিক চরিত্র, তার নিজের জীবনের

যা কিছু অপূর্ণতা যা কিছু অশুদ্ধতা— টুকীকে ভদ্রঘরের মেয়েদের মতো মানুষ করে যেন সে নিজে সেই সব কিছু থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়: 'এ মেয়েটি তার পেটের মেয়ে নয়— একেবারে পর— কিন্তু ইহার দিকে চাহিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তার দেহ যেন শীতল হইতে থাকে। চিরন্তনী কন্যা এ— বধূ, স্ত্রী, জননী— শরতের আকাশ যেমন অনাবিল, ইহার জীবনও আদি প্রান্ত হইতে কল্পনায় যতদূর দেখা যায় সেই শেষতম প্রান্ত পর্যন্ত তেমনি ছায়াহীন অনাবিল— পৃথিবীর কাহারো দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সঙ্কোচের হেতু নাই।'

কিন্তু হায়, সে ভুল ভেবেছিল! টুকী বড় হওয়ার পর আশপাশের লোকের কান-ভাঙানিতে টুকীর ভালো সম্বন্ধগুলি ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত বাহান্ন বছরের পাত্র পরিতোষের সঙ্গে তার বিয়ে হয় যদিও বিয়ের পর বোঝা যায় পরিতোষও একটি বিকৃত কামাচারী মানুষ, সুন্দরী নামে তার একটি রক্ষিতা আছে এবং এই সুন্দরীই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

লঘু-গুরুর গ্রন্থ পরিচয়ে জানানো রবীন্দ্রনাথের আরো একটি আপত্তি হল পরিতোষের মত 'কোমরবাঁধা শয়তান' চরিত্রের পরিকল্পনা তাঁর কাছে বাস্তবানুগ মনে হয়নি। বিদুষী পাঠিকা, আপনার যেহেতু পাসোলিনির 'আকাতোনে' দেখা আছে, আপনার অনুরূপ চিন্তা আসবে না বলে মনে হয়।

উপন্যাসের শেষাংশে (চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ) আর উত্তমকে নয়, টুকীকে আমরা দেখি পরিতোষ ও সুন্দরীর কদর্য সংসর্গে নিয়ত পীড়িত হতে। সুন্দরীর চক্রান্তে টুকীকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করাতে চায় পরিতোষ, টুকীকে বাধ্য করাতে না পেরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেয় সুন্দরী। বহিষ্কৃত হয়ে 'সুন্দরীর বাড়ির চৌকাঠ পার হইয়া সে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।'

লঘু-গুরু একদিক থেকে দেখলে যূথী ওরফে বনমালা ওরফে উত্তমের গল্প, অপাপবিদ্ধা টুকীর মঙ্গল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজের পূর্ব জীবনের অপচ্ছায়া থেকে সে টুকীকে গ্রহণমুক্ত করতে পারে না, স্বর্গসৃষ্টি করতে চেয়েও সে শুধু নরকই ডেকে আনে। শেষের দুই পরিচ্ছেদে যে অমোঘ ও দ্রুতগতিতে উপন্যাসটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে যে প্রতীতি হয় যেন গ্রীক ট্র্যাজেডি চরিত্রের মতই টুকীর নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমূহ সর্বনাশের দিকে। তা নয় কিন্তু— তলিয়ে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে উপন্যাসে বর্ণিত মোক্ষর মা, বিশ্বম্ভর, তার যাত্রাপার্টির বন্ধুরা, বঙ্কু, পরিতোষ, সুন্দরী— এইসব চরিত্রের তামসিকতা কদর্যতার কারণ— অর্থাভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং শিক্ষার অভাবজনিত পরিবেশে তাদের আটকে পড়া। জগদীশ গুপ্তের লেখার অনুপম শৈলীতে এসব রয়েছে অনেক গভীরে। তাঁর তির্যক ভাষা লঘু-গুরুকে আঙ্গিকগত দিক থেকে নির্ভার ও ধারালো রূপ দিয়েছে। লেখার বিষয়ের ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনাকে তিনি লেখার ভাষার উচ্ছ্বাসময়তায় লঘু হয়ে উঠতে দেননি। ভাষা দিয়ে যেন

তিনি উপন্যাসের থিমের থেকে একটা দূরত্ব তৈরি করতে চেয়েছেন, এক ধরনের ড্রাই হিউমার, ন্যূনতম শব্দব্যয়ের সংযম থেকে তাঁর লেখা কখনো বিচ্যুত হয়নি। ফলে কোনো জায়গার একটি ছোট বাক্যের বা একটি শব্দের অভিঘাত হয়েছে মারাত্মক প্রভাবশালী। যেমন, প্রথম পরিচ্ছেদে টুকী ও উত্তমের প্রথম সাক্ষাতের সময় :

'ঝাঁকড়া চুল নাচাইয়া টুকী ছুটিয়া আসিয়া নূতন মানুষ সম্মুখে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। উত্তম আবার বসিয়া পড়িল।

বিশ্বম্ভর একবার চকিতে উত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিল কে জানে, বলিয়া উঠিল,—টুকী, তোর মা।

টুকী তার মাকে দেখে নাই।

"এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?" বলিয়াই দৌড়াইয়া আসিয়া সে উত্তমের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। উত্তম তাহাকে কোলের উপর হইতে ধীরে ধীরে তুলিয়া হাত যতদূর যায় দু'হাতে ততদূরে ঠেলিয়া লইয়া তাহাকে যেন একবার পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপর তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল— পরবাসে ছিলাম মা।'

উত্তমের ছেড়ে আসা কলুষিত জীবনের পরিব্যাপ্ত বেদনা যেন এই ছোট্ট সংলাপটিতে সংহত হয়ে হাহাকার করে ওঠে।

জগদীশ গুপ্তের গোলোকবিহারী অথবা রবিবাবু

'... হাসালো নারায়ণ গুপ্ত কবিতায় দেখি এক বিপজ্জনক ব্যাপার—

স্বর্গপুরে সোরগোল লেগে গেল ভারি—
সংজ্ঞাশূন্য হয়েছেন গোলোকবিহারী, ...
নিমেষে দেখিয়া লয়ে শিব তাড়াতাড়ি
ছুটে গিয়ে ধরিলেন মূর্ছিতের নাড়ী।

এরপর নারায়ণ তাঁর সংজ্ঞা হারানোর যে কারণ বর্ণনা করেন তা অত্যাশ্চর্য, কুমারখালি গ্রামে নারাণ গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি—

চলেছে নিয়ত মূর্খ নিজস্ব বাতিকে
গদ্য পদ্য লিখে, লেখে গান গল্প ছড়া
জলীয় রসের— কভু ভারি কড়া কড়া।

এই দেখেই তার এমন হাসি পেয়েছিল যে তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। অবশ্য এই লঘু হাসির নেপথ্যে বাস্তবের কোনো গুরু ঘটনা, যেমন রবীন্দ্রনাথকৃত 'লঘু-গুরু' উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনার কথাই বলেননি তো জগদীশ গুপ্ত? কে জানে?

জগদীশ গুপ্ত : হীরেন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

যে বিষয় নিয়ে লিখছেন, সেই প্রস্তরসুলভ কঠিন নির্মম বাস্তবের সত্তাকে জগদীশ গুপ্ত পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন— সেই বাস্তবের রূপায়ণ করতে গিয়ে রোম্যান্টিকতা, ভাবপ্রবণতা কিংবা উচ্চ ভাবাদর্শজনিত দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। লেখকের ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর লেখার থিমের সঙ্গে একসুরে না মেলে তবে তিনি সেই থিমের রূপ দিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারেন। এটাকে বাংলা উপন্যাসের সেই প্রথম যুগের একটা ত্রুটি বলা যেতে পারে, ফলে বিশ্বম্ভর, পরিতোষ, সুন্দরীর মতো কদর্য চরিত্র ধরতে তাঁরা যে শুধু ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, এই ধরনের চরিত্র এবং যে আর্থসামাজিক পরিবেশে এদের বাস, উভয়ের অস্তিত্বই তাঁরা অস্বীকার করতে চেয়েছেন।

তথাকথিত কুৎসিত জিনিসের অন্তর্গত ফুল্লকুসুমিত সৌন্দর্য যে দেখতে জানে সেই শিল্পী। সুন্দরের সৌন্দর্য দেখতে তো প্রাণপাত করতে হয় না— প্রাণপাত করতে হয় কদর্যের সৌন্দর্য দেখতে। বাংলা উপন্যাসে লঘু-গুরু এক প্রবল ব্যতিক্রম। বিদুষী পাঠিকা, এ-প্রসঙ্গে হয়তো আপনার জাঁ জেনে-র 'থিব্‌স্ জার্নাল'-এর পাঠ-অভিজ্ঞতা মনে পড়তে পারে।

অসম্ভব আধুনিক গড়নের এই উপন্যাসের কাহিনীকে তিনি কোনো জায়গায় বিস্তারিত করেননি, বিদুষী পাঠিকার বোধশক্তি ও অকথিত অংশ কল্পনা করে নিতে পারার ক্ষমতায় আস্থা রেখেছেন— এই আত্মবিশ্বাস এক মহৎ লেখকের চারিত্র্য লক্ষণ। উত্তম ও টুকীর পারস্পরিক মানসিক বিনিময়ের অংশগুলি উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অংশ, কিন্তু সেখানেও চরিত্রদুটি সম্বন্ধে পাঠকের বিপুল সহানুভূতি গড়ে উঠুক, এও জগদীশ গুপ্ত চাননি। কারণ অশ্রু-উদ্রেককারী লেখার বিপদ হচ্ছে চরিত্রগুলির বিপন্নতা পাঠকের চেতনায় গভীরভাবে গেঁথে যেতে পারে না, ভাবপ্রবণতায় ভেসে যায়। বরং আমাদের কেন যেন মনে হয়, উত্তম-টুকীর কাহিনী যেখানে পাঠককে মুগ্ধ করতে বসেছে, চরিত্রদুটি যেখানে একেবারে পাঠকের মনের মধ্যে গিয়ে জীবন্ত হতে শুরু করেছে, সেখানেই লেখক নির্মমভাবে আমাদের সেই মায়া ভেঙে দিতে চেয়েছেন। বিদুষী পাঠিকা, ব্রেখটের অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বের কথাও আপনার মনে পড়ে যেতে পারে এ প্রসঙ্গে।

২০১১ সালে মানে বছর দশেক আগে জগদীশ গুপ্তের ১২৫ বর্ষপূর্তি কেটে গেছে উদ্‌যাপনহীন ভাবে। বছর দশেক পরে, ২০৩১-এ লঘু-গুরু প্রথম প্রকাশের শতবর্ষ— ততদিনে কি আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতে পারব, উদ্‌যাপনের জন্য ?

[এই লেখাটির জন্য হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'জগদীশ গুপ্ত' গ্রন্থটির কাছে অনিঃশেষভাবে ঋণী। ঋণ নিম্নলিখিত পত্রিকা ও রচনাগুলির কাছেও :

১। সুবীর রায়চৌধুরী : ভূমিকা — জগদীশ গুপ্তর গল্প

২। হাসান আজিজুল হক : জগদীশ গুপ্ত : কথাসাহিত্যের বিপরীত স্রোত

৩। জলার্ক : জগদীশ গুপ্ত বিশেষ সংখ্যা (শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮৮)]